এক লণ্ঠনওয়ালার গল্প

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

এক লণ্ঠনওয়ালার গল্প

সেদিন আমার সহকর্মী এসেই বললেন, কী, আপনার সেই পাখিরা কোথায়?

আমার বাড়িতে তার পাখি দেখতেই আসা। কারণ সহকর্মী এবং বন্ধু মানুষটি প্রায়ই আক্ষেপ করতেন, বোঝালেন, ছেলেবেলায় কত রকমের পাখি দেখেছি। আজকাল আর বুঝি তারা নেই। বসন্ত বউড়ি পাখি দেখেছেন? আমাদের বাগানে তারা উড়ে বেড়াত।

পাখি নিয়ে যখন তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়, তখন আমি সবে এ অঞ্চলে বাড়ি করছি। ফাঁকা জায়গা। গাছপালা বা জঙ্গল সবই আছে। ফাঁকা মাঠ আছে। পুকুর বাগান সব। বাড়ি করার সময় যেসব পাখি ছিল, ক-বছর পরে তাদের আর দেখা গেল না। তবু পাশের জঙ্গলে একজোড়া ডাহুক পাখি থাকত বলে, রাতে তাদের কলরব শুনতে পেতাম। ক-দিন থেকে তাদেরও আর সাড়া পাওয়া যায় না।

বন্ধুটি এলেন ঠিক, তবে তখন পাখিরা আর নেই, বনজঙ্গল নেই, মাঠ নেই, গাছপালা নেই—কেবল ইটের জঙ্গল বাদে এখন আর কিছু চোখে পড়ে না।

পাখি নিয়ে অফিসে কথা উঠলেই, সহকর্মীটির এককথা, ঠিক চলে যাব একদিন। একরাত থাকব আপনার বাড়িতে।

কথাবার্তা শুনলে মনে হবে—আমি যেন কোনো সুদূর রেল স্টেশন পার হয়ে এক নির্জন জায়গার বাসিন্দা। আমার বাড়ি তাঁর বাড়ি থেকে বাসে ঘন্টাখানেক লাগে না। কলকাতা শহর বাড়ছে। আগে দক্ষিণে বাড়ত, এখন সল্টলেক ধরে উত্তরের দিকটাতে বাড়ছে। দশ-বারো বছরের মধ্যে ফাঁকা ধানের মাঠ সব ঘরবাড়িতে ভরে গেছে। আসব আসব করে তাঁর এতদিন আসা হয়নি। কবি মানুষ হলে যা হয়। শেষে যখন হাজির তখন তাঁকে আমার আর কাক-শালিক বাদে কোনো পাখি দেখাবার উপায় নেই। তাঁকে বললাম, ওরা সব চলে গেছে।

কবিবন্ধুটির প্রশ্ন, কোথায় যায় বলেন তো!

আমরা দোতলার ব্যালকনিতে বসেছিলাম। বললাম, কোথায় যায় বলতে পারব না, নিশ্চয়ই যেখানে বনজঙ্গল আছে তারা সেখানেই যায়।

কবিবন্ধুটির আবার প্রশ্ন, বনজঙ্গল কি আর থাকবে। যেভাবে মানুষ বাড়ছে। এভাবেই বন্ধুটির কথা বলার অভ্যাস। একটু ফাঁকা জায়গা বনজঙ্গল পাখি প্রজাপতি দেখলে তাঁর আনন্দ হবারই কথা। শোভাবাজারের দিকে অত্যন্ত এক সরু গলির অন্ধকারের একতলা বাসা থেকে বের হলেই তাঁর বোধহয় পাখি প্রজাপতি দেখার শখ হয়। অবশেষে সেই দেখতেই আসা। আমরা মুখোমুখি বসে। বললাম, এই যে পাশের ডোবাটা দেখছেন, এখানে এই কদিন আগেও একজোড়া ডাহুক পাকি দেখেছি। আপনি আগে এলে দেখতে পেতেন। ক-দিন থেকে দেখছি তারাও নেই।

বন্ধুটি বললেন, যখন দেখা হল না, তখন পাখি নিয়েই গল্প হোক। আপনি কী কী পাখি দেখেছেন?

বুঝতে পারছি আমরা আজ বেশ মুডে আছি। ছুটির দিন। রাতে থাকবেন বন্ধুটি। খাবেন। সারা বিকেল, সন্ধে এমনকী গভীর রাত পর্যন্ত চুটিয়ে আড্ডা মারা যাবে। সংসারী মানুষের পক্ষে এগুলো খুব দরকার। হাঁপিয়ে উঠতে হয় না বুঝি। সময় করে

তাই কবিবন্ধুটি আজ আমার এখানে চলে এসেছেন। একটাই শর্ত, পাখি ছাড়া আমরা আর অন্য কোনো গল্প করব না।

বন্ধুটি বললেন, আমি লায়ার পাখির নাম শুনেছি। দেখিনি।

আমি একজন পাখি বিশেষজ্ঞ বলে তিনি মনে করেন। আমার লেখাতে তিনি অনেক পাখির নাম জেনেছেন। বোধহয় লায়ার পাখিরও। এককালে জাহাজে কাজ করতাম বলে পৃথিবীটা ঘুরে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। বললাম, ও-পাখি অস্ট্রেলিয়ায় দেখা যায়। জিলঙে দেখেছি।

তাঁর স্বাভাবিক প্রশ্ন, জিলঙ কোথায়?

বললাম মেলবোর্ন থেকে শ-দুই মাইল পশ্চিমে। খুবই ছোটো বন্দর। ওখান থেকে গম রপ্তানি হয়। আমরা গম নিতেই গেছিলাম। লায়ার পাখি আকারে বেশ বড়ো। চওড়া পালক। পাখা মেলে দিলে লায়ারের মতো দেখতে লাগে।

-লায়ারটা কী?

-ওটা একটা বিলেতি বাদ্যযন্ত্রের নাম। গায়ের রং মেটে। গলার দিকটা লাল। লেজের দিকটা সাপের ফণার মতো। খুব লাজুক পাখি। দেখলে বড়ো মায়া হয়। ঘাসের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকার স্বভাব।

এভাবে আরও অনেক পাখির কথা উঠল। সদা সোহাগি, শা' বুলবুলি, নীল কটকটিয়া, ভীমরাজ, ওরিওল, রেন, বেনেবৌ, ভাট শালিক, গাং-শালিক, মুনিয়া, দোয়েল, বুলবুলি, ছাতার পাখি, টিয়া, হাড়িচাঁচা কত আর বলব।

স্ত্রী চা ডালমুট রেখে গেল। দুজন সোফায় গা এলিয়ে বসে। পাখির কথা উঠতেই আমরা দুজনেই আমাদের শৈশব কালে চলে গেলাম। দুজনেরই শৈশব ওপার বাংলায় কেটেছে। জন্মেছি, বড়ো হয়েছি, সেখানে। দেশভাগ না হলে আমাদের দুজনের দেখা হবারই কথা ছিল না। দেশের নস্টালজিয়ায় পেয়ে বসেছে দুজনকেই।

বন্ধুটির আপশোস, বললেন, ইস্টিকুটুম পাখি এখানে এসে দেখেছেন?

বললাম, বাড়িঘর করার সময় এ-অঞ্চলে অনেক পাখি ছিল। ইস্টিকুটুম আমার ছাদের কার্নিশেই একবার উড়ে এসে বসেছিল। ছেলেরা এসে বলল, বাবা দেখো

এসে, দুটো সুন্দর পাখি আমাদের ছাদে এসে উড়ে বসেছে। উপরে উঠে দেখলাম। বললাম, এরা হল ইষ্টিকুটুম। দেশের বাড়িতে এরা ডাকলেই মা জেঠিমারা বলতেন, কুটুম আসবে। বন্ধুটির দিকে তাকিয়ে বললাম, জানেন, সত্যি দু একদিনের মধ্যে কুটুম চলে আসত বাড়িতে। একবার তিনুকাকা এলেন, ঠাকুমা বললেন, ইস্টিকুটুম ডেকে গেছে বাড়িতে, তুই আসবি জানতাম।

বন্ধুটির প্রশ্ন, পাখিদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কতটা?

আমি বললাম অনেক। ধরুন, আমার বাড়িটা যদি আরও বড়ো হত, গাছপালা লাগাতে পারতাম, তবে কিছু পাখি এসে থাকতে চাইত। আমার বাবা জানেন, দেশ থেকে এসে বিঘে পাঁচেকের মতো জমি কিনে কোনোরকমে থাকবার মতো টালির ঘর করলেন। ঠাকুরঘর বানালেন। রান্নাঘর। কাঠা চারেকের মধ্যে সব। বাকি জায়গাটায় কত রকমের যে ফলের গাছ লাগালেন! আবাদ করার জন্য কোনো জমি রাখলেন না। মা গজ গজ করত, গাছ তোমাকে খাওয়াবে।

বাবা হাসতেন। মা আরও রেগে যেত। বলত, জমি চাষ-আবাদ করলে সংসারের অভাব মিটত। বাবা হয়তো স্নান করে ফিরছেন কালীর পুকুর থেকে—দেখি বাবা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। একঝাঁক পাখি উড়ে আসছে। বাবা বলতেন, কেন আসছে জানো? ওরা বুঝেছে। এই গাছপালায় তাদের আমি বসার জায়গা করে দিয়েছি। বাসা বানাবার জায়গা করে দিয়েছি। ফল-পাকুড় হবে, তোমরা খাবে, ওরা খাবে না—সে হয়!

চায়ে চুমুক দিয়ে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি। বন্ধুটি বললেন, কী ভাবছেন?

ভাবছি গাছপালা, পাখপাখালি না থাকলে বাড়ির সৌন্দর্য বাড়ে না। কত রকমের পাখি এসে উড়ে বসত। বাবা বলতেন, চেনো!

আমরা জানি, বাবা পাখিদের নাম বলবেন। বাবাই আমাকে কোনটা কী পাখি, তার স্বভাব চরিত্র, কোথায় বাসা বানায়, ক-টা করে ডিম পাড়ে সব বলতেন। আমরা ভাইবোনেরা ভারি কৌতূহল নিয়ে শুনতাম। ফল-পাকুড়ের সময় পাখির উপদ্রব বেড়ে যেত। মা গজগজ করত। দ্যাখ গাছে টিয়ার ঝাঁক বসেছে। সব কামরাঙ্গা সাফ করে দিচ্ছে।

বাবা ইশারায় আমাদের বারণ করতেন। তখন মা নিজেই কোটা নিয়ে ছুটত। পাখিদের তাড়াত। বাবা হাসতেন।

মা রেগে গিয়ে বলত, হাসছ কেন?

হাসছি এমনি। তু

মি এমনি হাসার মানুষ! কেন হাসলে বল!

বাবা ঠাকুরঘরে হয়তো যাচ্ছেন। গৃহদেবতার পূজার সময় হয়ে গেছে। ঘরে ঢোকার আগে বলতেন, ওরা জানে বাড়ির মালিক তাদের পছন্দ করে। তুমি যখন দিবানিদ্রা যাবে ওরা তখন আসবে। আমি বলে দিয়েছি, সময় বুঝে আয়। যখন তখন এলে চলে! দেখছিস না বাড়ির মাঠান রাগ করে!

কবিবন্ধুটি বিস্ময়ে বললেন, ওরা আসত।

ঠিক আসত! মা দিবানিদ্রা গেলেই ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসত। বাবা বলতেন, পাখি প্রজাপতি, গোরুবাছুর অর্থাৎ তিনি প্রাণীকুলের কথাই বলতে চাইতেন—না থাকলে মানায় না। জানেন, যদি টাকা থাকত, আর দু-চার কাঠা জমি রাখতে পারতাম—বাবার মতো আমার বাড়িতেও গাছপালা লাগিয়ে দিতাম। গাছপালা লাগানোর মধ্যেও বড় একটা আনন্দ আছে। বাড়িতে গাছপালা না থাকলে, পাখি প্রজাপতি উড়ে না এলে বাড়ির জন্য মায়াও বাড়ে না।

বন্ধুটি কী ভেবে ডাকলেন, বউঠান আর এক রাউণ্ড চা। আমরা এখানে জমে গেছি। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন, তাহলে কি আমাদের দেশবাড়ির জন্য যে নস্টালজিয়া, তা এই গাছপালা, পাখি প্রজাপতির জন্য?

বললাম, তার বিস্ময় সে প্রকৃতির মধ্যে বড়ো হয়ে উঠেছে। এঁদো গলিতে যে জন্মায়, বড়ো হয়ে তার কিছু থাকে না। শহরের ঘরবাড়ির জন্য মানুষের এ কারণে টান কম।

কবিবন্ধুটি বললেন, আমাদের কিন্তু আজ কথা ছিল পাখি ছাড়া অন্য কোনো কথা হবে না। পাখি দেখাবেন বলে এনেছেন। দেখছি জায়গাটা যা হয়ে গেছে, তাতে কাক-শকুনের উপদ্রব বাড়তে পারে। আসল পাখি সব উধাও।

স্ত্রী চা রেখে গেল। একটা সিগারেট ধরালাম। ছুটির দিন, প্রসন্ন মেজাজ। বন্ধুটির কথায় রাগ করা গেল না। আসলে সেই কবে বলেছিলাম, যখন সবে বাড়িঘর বানাতে শুরু করি তখন। বন্ধুটি প্রায়ই বলতেন, জায়গাটা কেমন? গাছপালা মাঠ আছে? বিশাল আকাশ দেখতে পান? নির্জন নিরিবিলি? পাখি প্রজাপতি আসে?

আমি বলেছিলাম, আসে।

তাহলে তো একদিন বেড়াতে যেতে হয়।

আসুন না।

বললাম, আসব আসব করে দশটা বছর পার করে দিলেন। কলকাতার আশেপাশে কোনো ফাঁকা জায়গা পড়ে থাকবে না। একটু ফাঁকা জায়গায় থাকব বলে, এখানে বাড়িটা করি। দেখছেন তো জায়গাটা কী হয়ে গেল! ওই যে সামনের ঘরবাড়ি দেখছেন, সেখানে সব ধানের জমি ছিল। ওই যে ও-পাশের রাস্তা দেখছেন, সেখানে গেলে এক বুড়ো লণ্ঠনওয়ালাকে দেখা যেত। সে দূর দূর গাঁয়ে যেত সকালে, ফিরত সন্ধ্যা হলে।

লণ্ঠনবাতি নিজে বানাত। গাঁয়ে গাঁয়ে বিক্রি করত। আমার সঙ্গে লোকটির খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছিল। বলেছিল, হুজুর, আপনি এমন পাণ্ডববর্জিত এলাকায় বাড়ি করলেন।

ওকে বলেছিলাম, একদম হুজুর হুজুর নয়। তুমি আমার সঙ্গী। এ জায়গা ছেড়ে তোমার কোথাও যেতে ইচ্ছা হয়?

না মরে গেলেও যেতে পারব না।

কেন না!

সে বলতে পারব না। গাছপালা পাখি এই ফসলের মাঠ নিয়ে বেঁচে আছি বাবু। কোথাও ভালো লাগবে না। আমার সঙ্গে তার বিচিত্র সব গল্প হত। সে কোথায় লণ্ঠনবাতি বিক্রি করতে যায়, রাস্তায় যেতে যেতে কার দাওয়ায় বসে, কোথায় একটা ছোট্ট মশলাপাতির দোকান আছে, সেখানে বিড়ি পর্যন্ত পাওয়া যায়। এসব খবরই দিত। এই যে পাশের খাল দেখছেন, সারা বর্ষাকাল ধরে খড়ের নৌকা যেতে দেখেছি। এসব দেখাব বলেই আসতে বলেছিলাম।

বন্ধুটি বললেন, দুর্ভাগ্য। আপনার পাখি প্রজাপতি দেখা হল না। খড়ের নৌকাও দেখা গেল না। সেই লণ্ঠনওয়ালার কাছে চলুন না। সন্ধেটি বেশ কাটবে।

সে তো আর এখানে নেই। জমিটুকু বেচে দিয়ে আরও ভেতরে চলে গেছে। সে নাকি অনেক দূরে। ভালোই আছে সেখানে। বাসে যাওয়া যায়। বাস থেকে নেমে মাইলখানেক হাঁটতে হয়। জমির খুব ভালো দাম পেয়ে গেল, আমায় এসে বলল, বুঝলেন, থাকা যাবে না। আপনি এসেই জায়গাটার বারোটা বাজালেন।

অবাক আমি! সে বলল, তাই। আপনার দেখাদেখি সব ভদ্দরলোকেরা আসতে শুরু করে দিলেন। জমির দর বেড়ে গেল। এত টাকা একসঙ্গে জীবনেও দেখিনি বাবু।

বন্ধুটি বললেন, আসলে আমরা তাকে উৎখাত করেছি।

তাই বলতে পারেন।

সে যাকগে।

আমি বললাম, না যাকগে নয়। শুধু তাকে উৎখাত করিনি, তার স্বপ্নের পৃথিবী থেকে বনবাসে পাঠিয়েছি।

বন্ধুটি হেসে বললেন, সে সেখানেও নিজের মতো স্বপ্নের পৃথিবী বানিয়ে নেবে। ও নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।

সে হয়? সে রোজ গাঁয়ে গাঁয়ে গেছে, সে সারাজীবন তার নিজের মানুষের সঙ্গে বড়ো হয়েছে, গাছপালা মাঠ সবই তার অস্তিত্ব, সে টাকার বিনিময়ে সব হারিয়ে চলে গেছে। একজন লণ্ঠনওয়ালা এখন হয়তো কোথাও একটা চা-বিড়ির দোকান করেছে। কিন্তু বাড়ির পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া, গাঁয়ের কোনো সুন্দরী বউয়ের ডাক, এই লণ্ঠনওয়ালা তোমার কুপির দাম কত গো, একটা দিয়ে যাও না! বউটির সঙ্গে কুপির দর নিয়ে কষাকষি, একটু বসে জিরিয়ে নেওয়া, কিংবা সংসারের দুটো সুখ-দুঃখের কথা, এসব সে আর পাবে কোথায়? তার বাড়িতে ছিল দুটো নারকেলগাছ, একটা আমগাছ, লেবু করমচা, সবই সে লাগিয়েছিল। এরা তার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে। সে তাদের ভুলবে কী করে! টাকার লোভে একজন লণ্ঠনওয়ালা সব বেচে দিয়ে চলে গেল।

ঠিক এসময় বন্ধুটি স্মরণ করিয়ে দিলেন, আমাদের কিন্তু আজ শুধু পাখির গল্প। লণ্ঠনওয়ালার জন্য দুঃখ করলে পাখিরা সব উড়ে যাবে।

হামি হাসলাম।

আসলে বাড়িটা করার সময় এই নির্জন মাঠে এতসব বিচিত্র পাখি দেখেছি যে, অফিসে গিয়ে সবার কাছে গল্প না-করে পারিনি। কারণ গাঁয়ে জন্মালে মানুষের বোধহয় এই হয়। শহর মানুষের অনেক মমতা নষ্ট করে দেয়। প্রকৃতির উদার আকাশ, বিশাল ধানের মাঠ, দিগন্তে কোনো বড় লাইটপোস্টের ছবি এবং নীল সমুদ্রের মতো রাশি রাশি মেঘ যখন বাড়ির মাথার উপর দিয়ে ভেসে যেত তখন আমার শৈশব এসে জানালায় উঁকি মারত। আমি স্থির থাকতে পারতাম না। অফিসে জায়গাটা নিয়ে খুব গল্প করতাম।

বন্ধুটি বলল, কোনো কোনো জাতের পাখি খুব হিংস্র হয় শুনেছি। এদের জন্য তো মায়া হবার কথা না।

বললাম, হিংস্র বলছেন কেন! বাঁচার তাগিদে সব। তবে একটা পাখির গল্প বলি শুনুন। আজকালকার ছেলেমেয়েরা মাইলখানেক রাস্তা হাঁটতে হলেই গেল। বাস স্ট্রাইক হলে,

মাথায় হাত। চার-পাঁচ মাইল হেঁটে গেলেই বাড়ি, অথচ মুখ দেখলে মনে হবে কত বড়ো সর্বনাস হয়ে গেছে। বাড়ি ফেরা বুঝি হবে না।

আর আমরা রোজ চার মাইল রাস্তা হেঁটে স্কুল করেছি। গাঁয়ের পনেরো যোলোজন ছাত্র একসঙ্গে বের হতাম। ফিরতাম একসঙ্গে। সারাটা রাস্তা আমাদের কাছে কতরকমের কৌতূহল নিয়ে জেগে থাকত। গ্রীষ্মের প্রখর রোদে হাঁটছি পথে কারও আমবাগান, লিচুবাগান, পেয়ারার গাছ, কুলের গাছ, কোথায় কী গাছ সব আমাদের জানা, কোথায় কোন গাছে কখন কী ফল হবে সব জানা। কেউ ফল, গোলাপজাম, ঢেউয়া কতরকমের গাছই ছিল আমাদের জীবনের সঙ্গী। চুরি করতাম, ছুটতাম, খেত থেকে ক্ষিরাই চুরি করে খেতাম। গ্রাম মাঠ বিল পার হয়ে এক আশ্চর্য তীর্থযাত্রা ছিল প্রতিদিন।

বন্ধুটি আজ যেন আমার নস্টালজিয়াকে আক্রমণ করতেই এসেছেন। তিনি বললেন, এতে পাখির গল্প কোথায়?

দাঁড়ান বলছি। বলে উঠে বাথরুমের দিকে গেলাম। আসলে সাঁজ লেগে আসছে। রাতে বন্ধুটি খাবে। ঘরে কী আছে না আছে খবর রাখি না। একবার অন্তত জানা দরকার,

রাতে কী হচ্ছে। স্ত্রীকে নীচে সিঁড়ির মুখে পেয়ে গেলাম। বললাম, গৌরাঙ্গবাবু কিন্তু আজ রাতটা এখানে কাটাবেন। রাতে খাবেন।

স্ত্রীর এক কথা, তোমাকে ভাবতে হবে না। বাড়িতে বাজার, কেনাকাটা স্ত্রীই করেন। এমনকী রান্নাবান্নাও করা হয়ে আছে বোধহয়। শুধু গ্যাস জ্বেলে গরম করে নেওয়া। কাজেই ফের উঠে এসে বললাম, জামাকাপড় ছাড়ুন। পাখির গল্পটা না হয় রাতে খেতে বসে শুনবেন।

বন্ধুটির এককথা, খাওয়ার সময় কোনো হিংস্র পাখির গল্প বললে, গল্পটা জমতে পারে, খাওয়াটা জমবে না।

আমি জানি, গৌরাঙ্গবাবু ভোজনরসিক। খেতে ভালোবাসেন। কোনো এক কবি সম্মেলনে গিয়ে তিনি কুড়িটা ডিমই খেয়েছিলেন, সেসব গল্প কানে এসেছে। এক ফাঁকে স্ত্রীকে বললাম, ইনিই সেই কুড়িটা ডিম।

ইনিই সেই কুড়িটা ডিম শুনে স্ত্রী কেমন সামান্য ঘাবড়ে গেল। তারপর কী ভাবল কে জানে, বলল, কুড়িটার জায়গায় ত্রিশটা—এর বেশি তো লাগবে না। আমি আনিয়ে রাখছি।

তুমি কী রাতে।

সব আছে। তোমার তো মনে থাকে না। সেদিন সকালে বললে না, রোববারে আমার এক সহকর্মী আসতে পারেন। থাকতে পারেন। খেতে পারেন। খেতে খুব ভালোবাসেন।

ভুলেই গেছি। আমি উপরে উঠে এলাম। গৌরাঙ্গবাবু ব্যালকনিতে পায়চারি করছেন। আমাকে দেখেই বললেন চলুন ছাদে যাওয়া যাক। আমরা ছাদে কিছুক্ষণ পায়চারি করলাম। অনেক দূরের।

ঘরবাড়ি চোখে পড়ছে। কিন্তু গাছপালা কম। বলতে গেলে সামনের দিকটায় একসময় বনভূমি ছিল। এখন আর তার চিহ্ন নেই। বাড়ির পেছনটায় কয়েকটা গাছ লাগিয়েছি। গাছগুলো বড়ো হচ্ছে। সবই ফুলের, শেফালি, কামিনী এবং স্থলপদ্মের গাছ।

গৌরাঙ্গবাবু ঝুঁকে দেখলেন। বললেন, এগুলি বুঝি আপনার সান্ত্বনা? বললাম, বলতে পারেন। গৌরাঙ্গবাবু বললেন, চলুন ওই গাছগুলোর নীচে গিয়ে বসি। নীচে নেমে এলাম। বেশ ঘন অন্ধকার। বললাম, আলো জ্বেলে দি। ঘাসের উপর চেয়ার পেতে দিয়ে গেল কাজের লোকটা। প্রায় অন্ধকারে বসে গৌরাঙ্গবাবু বললেন, এখানে মনে হয় আপনার হিংস্র পাখির গল্পটা জমবে।

বললাম, দেখুন পাখিটা অতিকায়।

কী পাখি?

কী পাখি প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেলাম। তারপর কী ভেবে যে বললাম, সাপটা আরও অতিকায়।

তার মানে। পাখি সাপ!

আসলে আমাদের সমাজজীবনে শুধু এই পাখি এবং সাপের খেলা চলছে।

বুঝলাম না।

আমি কাউকে দোষ দিই না। নিজেকে শুধরে নিলাম।

গৌরাঙ্গবাবু খুবই অধৈর্য হয়ে পড়ছেন—সোজাসুজি বলুন না।

তখন চৈত্র মাস। স্কুল থেকে ফিরছি। জমি উরাট। গ্রাম থেকে নামলেই ফসলের মাঠ, পরে গোপের বাগ বলে একটা গাঁ। গাঁ ছাড়ালেই বিশাল বিলের জায়গা। ওটা পার হয়ে গেলে খংশারদির পুল। পুল পার হয়ে গেলে পোদ্দারদের প্রাসাদের মতো বাড়ি, বাগান, তারপর গঞ্জের মতো জায়গায় আমাদের স্কুল। এতটা রাস্তা আমাদের রোজ হাঁটতে হয়। যাবার পথে, ফেরার পথে কখনো মনে হয়নি স্কুলটা আমাদের খুব দূর।

গৌরাঙ্গবাবু বললেন, পাখি গেল কোথায়?

আসছে, এবারেই আসবে। বললাম না, চৈত্র মাস। সারা মাঠে চাষ-আবাদ নেই বললেই চলে।

নীচু জমিতে ক্ষিরাইর চাষ। ক্ষিরাই, বাঙ্গি, তরমুজ ফলে আছে। জানেন তো, বড়ো তরমুজের নীচে খড় দিতে হয়। উপরেও দিতে হয়। যাতে চোখ না লাগে সেজন্য খড় দিয়ে তরমুজ ঢেকেও রাখা হয়। কিন্তু আমাদের চোখকে ফাঁকি দেয় কে! একটা আস্ত বড়ো তরমুজ চুরি করে গাছতলায় বসে খেয়ে, তার ছালবাকল আবার সেখানেই রেখে আসার মধ্যে, আমাদের একটা মজা ছিল। মজা করতে গিয়েই তাড়াটা খেয়েছিলাম।

কে তাড়া করল? জমির মালিক?

ধুস! একটা শাদা খরিস।

খরিস?

সে না দেখলে তার বিশাল ফণা কত বড়ো হতে পারে বিশ্বাস করতে পারবেন। হাত দুই দূরে ফণা তুলে আমার মুখের সামনে দুলছে। আমি চোখ খুলে আছি। সারা অঙ্গ অবশ। দূরে পালাচ্ছে সবাই। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। যেন বলছে, কি, আর চুরি করবে?

গৌরাঙ্গবাবু বললেন, যান মশাই, ও সময় এসব কথা মনে হয়। মস্তিষ্কের ঘিলু তো গলে যাবার কথা!

জানি না, এটাই আমার মনে হয়েছিল, বাস্তু সাপটাপ নাকি এমন করে! শুধু বিড় বিড় করে বলছি, দোহাই আস্তিক মুনি। জানি একটু নড়লেই আমার মাথায় ছোবল বসাবে। নড়ছি না আর তখনই কী না...

কী তখন?

দেখলাম কোত্থেকে একটা বিশাল পাখি উড়ে এল! একটা বাজপাখি। এসেই গলার কাছে সাপটে ধরতেই আমি ছুটে পালাব ভাবলাম। কিন্তু এ কি! সাপটা বিশাল লেজ দিয়ে পাখিটার পা পাখা সব জড়িয়ে ধরেছে। খণ্ডযুদ্ধ। আমার সব বন্ধুদের ডাকছি। দেখছি কেউ নেই। দূরে দাঁড়িয়ে দেখছি বাজপাখির হিংস্র চোখ জ্বলছে। সাপের হিংস্র চোখ

জ্বলছে। পাখিটা কিছুতেই গলার কাছে লেজ আনতে দিচ্ছে না। গলা বাঁকিয়ে ফণায় মাথায় ঠুকরে সাপের মগজ থেকে ঘিলু তুলে নিতেই বিশাল সেই দানব এলিয়ে পড়ল। এযারে পাখিটার শরীর থেকে সব প্যাঁচ

খুলে গেল। পাখিটা সাপটাকে নিয়ে অনায়াসে উড়ে যাচ্ছে। এমন ভয়ংকর দৃশ্য আমি জীবনে দেখিনি। এমন ভয়ংকর সৌন্দর্য জীবনে অনুভব করিনি! বিশাল আকাশের নীচে অবলীলায় উড়ে যাচ্ছে।

গল্পটা শোনার পর গৌরাঙ্গবাবু বললেন, আদিমকাল থেকেই এটা চলছে। সবলেরা বেঁচে থাকে। দুর্বলেরা চলে যায়।

আমি শুধু বললাম, এজন্য লণ্ঠনওয়ালার খোঁজে আর আমি যাইনি। সে যখন

বাড়ি জমি বিক্রি করে দেখা করতে এসেছিল, আমি তার সঙ্গে দেখাও করিনি। কারণ সব নষ্টের মূলে আমি। ওর উৎখাত হওয়ার মূলে আমি। আমার স্ত্রীকে বলে গেছিল একসঙ্গে এত টাকা নাকি সে জীবনেও দেখেনি।

গৌরাঙ্গবাবু বললেন, আপনি না এলেও তাকে উৎখাত হতে হত। পৃথিবীতে সবসময় একজন আর একজনকে তাড়া করছে।